# স্বাধীন বাংলাদেশ

## Independent Bangladesh

ইউনিট
২

ভূমিকা : বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খানের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেন। ২৮ নভেম্বর তিনি এক ভাষণে দেশে পুনরায় সর্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের ঘোষণা দেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। একাধিক রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফল ছিল ছয় দফাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক ছিল না। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণ করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। বিজয় অর্জনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

| | |
|---|---|
| **ইউনিট সমাপ্তির সময়** | **ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৪ দিন** |

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**

পাঠ-২.১: মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট
পাঠ-২.২: সশস্ত্র সংগ্রাম ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়
পাঠ-২.৩: স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও বঙ্গবন্ধুর শাসনামল
পাঠ-২.৪: বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন

# পাঠ-২.১ মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট
## Background of Liberation War

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–**

- ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও এর ফলাফল সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
- শেখ মুজিবুর রহমান ও ইয়াহিয়া খানের আলোচনা সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক ২৫ মার্চের গণহত্যার বিবরণ দিতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন, ৭ মার্চের ভাষণ, গণহত্যা ইত্যাদি। |

### ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সকল প্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে দেশে পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেন। রাজনৈতিক দলগুলোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ ও ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। কিন্তু বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে যায়। পুণরায় তারিখ ঘোষণা করা হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এবারও বাধা আসে। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসে মানুষ ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। শুধু উপকূলীয় অঞ্চলের জাতীয় পরিষদের ৯টি ও প্রাদেশিক পরিষদের ২১টি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি।

### নির্বাচনের ফলাফল

নির্বাচনে মোট ২৪টি দল অংশগ্রহণ করে। তবে নির্বাচনী প্রচারণায় মূলত আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রাধান্য লাভ করে। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ‘নৌকা’ প্রতীক নিয়ে ঐতিহাসিক ছয় দফার পক্ষে প্রচারাভিযানে নামেন। আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ও ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের এগার দফার ভিত্তিতে এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৪৪টি আসনের মধ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৮৮টি আসন লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি (১০টি মহিলা সংরক্ষিত আসন ছাড়া) আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮ টি আসনে জয়লাভ করে। এভাবে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে। নির্বাচনে জয়লাভ করলেও আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজি ছিলেন না পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি তাদের এই বিমাতাসূলভ আচরণ মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচনা করে।

### নির্বাচনের গুরুত্ব

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীন সর্বোভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে বাঙালির যে স্বাতন্ত্র্যবোধ তা স্বীকৃতি পায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর এটিই ছিল সবচেয়ে বেশি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। নির্বাচনে জয় লাভের মধ্যে দিয়ে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। এর ফলে ভাষা ভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ সুদৃঢ়

ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের বিজয়ের মাধ্যমে এ দলটির নেতৃত্ব জাতি মেনে নেয়। সর্বোপরি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এ নির্বাচন আপরিসীম ভূমিকা রাখে।

## ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভূট্টোর ভূমিকা

পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। ১৯৭০ সালে তাঁর দল জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ৮৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয়লাভ করায় সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান ও ভূট্টো বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। পরিস্থিতির চাপে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১৯৭১ সালের ১২ ও ১৩ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠক করেন। তিনি সাংবাদিকদের কাছে শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মন্তব্য করেন।

কিন্তু ধীরে ধীরে দেখা গেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন না ডেকে সময় ক্ষেপন করছেন। জুলফিকার আলী ভূট্টো ঢাকায় আসেন এবং ২৭ থেকে ২৯ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করেন। ইয়াহিয়া খান ১৪ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেন যে, সংবিধান প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে ঢাকায় ৩ মার্চ। কিন্তু ভুট্টো ঘোষণা করেন ছয় দফা দাবির পরিবর্তন না করা হলে তিনি অধিবেশনে যোগ দেবেন না। ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ হঠাৎ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন। ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণা বাঙালিদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচিসমূহের মধ্য দিয়েই এ দেশ মুক্তিযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে।

## অসহযোগ আন্দোলন

১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে পাকিস্তানের সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্বের আসনে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানি সামরিক শাসক স্বাভাবিক পথে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। আন্দোলনের মাধ্যমে তা আদায় করে নিতে হবে। তিনি ১৯৭১ সালের ২ ও ৩ মার্চ হরতাল এবং ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জনসভার কর্মসূচি ঘোষণা করেন। যথাসময়ে হরতাল কর্মসূচি পালিত হয়। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশের পর ডাকসু'র ভি.পি আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে কলাভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথমবারের মতো উত্তোলন করেন। এই দিনে হরতাল চলাকালে মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে পূর্ব বাংলার মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আন্দোলন ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় । তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র প্রচার করে। সভা থেকে বঙ্গবন্ধু ২-৬ মার্চ প্রতিদিন ভোর ৫-২টা পর্যন্ত হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই অবস্থাকে সামাল দিতে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার তারিখ নির্ধারণ করেন। এই সময়ে লেফট্যানেন্ট জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

## বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের সমাবেশে লক্ষ লক্ষ জনতার ঢল নামে। বঙ্গবন্ধু নির্দিষ্ট সময়ে রেসকোর্স ময়দানে সমাবেশে উপস্থিত হয়ে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু এ সমাবেশে যে ভাষণ দেন তা বিশ্বের ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছে। এই ভাষণে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান এবং দেশকে মুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল। যথা: ক) চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার, খ) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া, গ) গণহত্যার তদন্ত করা এবং ঘ) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

এছাড়াও তিনি আরও কিছু দাবি উত্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশের সকল অফিস-আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। এ সমাবেশে সরকারের কড়া নজরদারি ছিল। তাই কৌশলগত কারণে বঙ্গবন্ধু প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা না করে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। প্রত্যক্ষ ঘোষণা দিলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হতো। তিনি মুক্তিসংগ্রামে সকলকে প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দেন। দেশকে শত্রুমুক্ত করতে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের

আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের এই ভাষণটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে 'বজ্রকণ্ঠ' নামে প্রচারিত হয়। ভাষণটি বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা পাগল জনগণের সর্বাত্মক অসযোগিতার কারণে সকল সরকারি কর্মকাণ্ড প্রায় অচল হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ সদর দপ্তর হতে জারিকৃত আদেশ বলে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসন চলতে থাকে। ১৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনার জন্য ৩৫ দফাভিত্তিক দাবিনামা জারি করেন। সেখানে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনসাধারণকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেয়া হয়।

## শেখ মুজিবুর রহমান- ইয়াহিয়া খান আলোচনা

বঙ্গবন্ধুর আদেশ জারির পর থেকে শুধু ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া প্রায় সর্বত্র আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অবস্থার গভীরতা উপলব্দি করে ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেন। বঙ্গবন্ধু আলোচনায় রাজি হলেও অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেননি। ১৬ মার্চ থেকে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা শুরু হয়। একদিকে আলোচনা শুরু হয় অন্যদিকে ১৭ মার্চ  টিক্কা খান, রাও ফরমান আলী 'অপারেশন সার্চ লাইট' বা বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার নীলনকশা তৈরি করে। ১৯ মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যরা জয়দেবপুরে নিরীহ বাঙালিদের ওপর হামলা চালায়। এরপর ২২ মার্চ জুলফিকার আলী ভূট্টো ঢাকায় আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। ভুট্টো ছয় দফার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা জটিল করে তোলেন। আসলে এভাবে তারা সময় ক্ষেপন করছিলেন। আর অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য আর রসদ আনা হচ্ছিল এ দেশে। স্বাধীনতার আন্দোলন ক্রমে তীব্র হতে থাকে। চট্টগ্রামে এম. ভি. সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে শ্রমিকরা অস্বীকার করে। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস। এদিন পূর্ব পাকিস্তানের ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হয়। ২৪ মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সংকট সমাধানের শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু আলোচনা অসমাপ্ত রেখে ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন।

## ২৫ মার্চের গণহত্যা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক নিরস্ত্র বাঙালিদের নির্বিচারে গণহত্যা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র, নিরীহ, স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষের উপর হামলা করে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালায়। পাকিস্তানিরা বাঙালিদের হত্যার এই অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন সার্চ লাইট'। ২৫ মার্চ রাতে এই অভিযান পরিচালনা করলেও মূলত মার্চের প্রথম থেকেই তারা এর পরিকল্পনা করে। ১৯ মার্চ থেকে পূর্ব বাংলায় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ শুরু হয়। ২০ মার্চ সরকার অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ জারি করে। ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে এম. ভি. সোয়াত থেকে অস্ত্র ও রসদ খালাস শুরু হয়। সব প্রস্তুতি শেষে ২৫ মার্চ গণহত্যার জন্য বেছে নেয়া হয় এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে ঢাকা শহরের মূল দায়িত্ব দেয়া হয়।

ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। যাবার আগে সেনাবাহিনীকে পূর্বপাকিস্তানিদের উপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে যান। ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ মোতাবেক গভর্নর টিক্কা খানের ঘাতক সৈন্যরা ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যার তাণ্ডবলীলা চালায়। এই গণহত্যা চলেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, পুরনো ঢাকায়, কচুক্ষেত, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে, রায়ের বাজার, ধানমন্ডি, কলাবাগান, কাঁঠালবাগানসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে।

২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যা শুরু হলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তা ওয়্যারলেসযোগে পাঠিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা শোনামাত্রই চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানার ইপিআর ঘাঁটি এবং রাজনৈতিক দলের কার্যালয়সমূহে আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। নৃঃশংস গণহত্যার সংবাদ যাতে বিদেশে ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ২৫ জন বিদেশী সাংবাদিককে আটক করা হয়। শুরু হয় পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে বাঙালি পুলিশ, আনসার ও সাধারণ মানুষের এক বীরত্বপূর্ণ লড়াই যা বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | ক) বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের সারাংশ লিখুন।<br>খ) পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক ২৫ মার্চের গণহত্যার বিবরণ লিখুন। |

## সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি দীর্ঘ পটভূমি রয়েছে। তবে ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নানা টালবাহানা মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছিল। নির্বাচনে বাংলদেশ আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় বঙ্গবন্ধু অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভুত হলেন। তাঁর নেতৃত্বেই অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হয় কত তারিখে?

(ক) ২৬ মার্চ ১৯৬৯ (খ) ২৫ মার্চ ১৯৭০

(গ) ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ (ঘ) ২৫ মার্চ ১৯৭১

২। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের কতটি আসন লাভ করে?

(ক) ৮৮টি (খ) ১৬৭টি

(গ) ১০০টি (ঘ) ১৫০টি

৩। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা দিয়েছিলেন—

(ক) গণপরিষদের নির্বাচনে (খ) ৭১-এর ২৫ মার্চে

(গ) ৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরে (ঘ) ৭ মার্চের ভাষণে

# পাঠ-২.২ সশস্ত্র সংগ্রাম ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়
## Militant Movement and Birth of Independent Bangladesh

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–**

- মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- মুজিবনগর সরকার সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন, পরিচালনা এবং এর পক্ষের বিভিন্ন সংগঠনের বিবরণ দিতে পারবেন;
- স্বাধীনতাবিরোধী বিভিন্ন সংগঠন ও বাহিনীর কর্মকাণ্ড বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের সমর্থন ও সহযোগিতা, মিত্রবাহিনী গঠন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | মুক্তিযুদ্ধ, মুজিবনগর সরকার, স্বাধীনতাবিরোধী সংগঠন/বাহিনী, মিত্রবাহিনী। |

### সশস্ত্র সংগ্রাম ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল এ দেশের মুক্তিসংগ্রামের মাইলফলক ও প্রেরণার উৎস। এই ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়েছে। ২৫ মার্চ দিবাগত রাত দেড়টায় শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে (২৫ মার্চ রাত ১২ টার পর) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি এ ঘোষণা ওয়্যারলেসযোগে চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। এজন্যই ২৬ মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। মূল ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে। এর বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ:

> ‘ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।’ (বাংলাদেশ গেজেট, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী, ৩ জুলাই ২০১১)

স্বাধীনতার এ ঘোষণা বাংলাদেশের সকল স্থানে তদানীন্তন ইপিআর এর ট্রান্সমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ২৬ মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্র থেকে একবার এবং সন্ধ্যায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয়বার প্রচার করেন। ২৭ মার্চ কালুরঘাটে স্থাপিত স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র (পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং এর প্রতি বাঙালি সামরিক, আধাসামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর সমর্থন ও অংশগ্রহণের খবরে স্বাধীনতাকামী জনগণ উজ্জীবিত হয়। এরপর ১০ এপ্রিল প্রবাসে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার ভিত্তিতে জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার আহ্বান জানানো হয়। এ ঘোষণায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হতে স্বাধীনতা ঘোষণা কার্যকর বলে গণ্য করা হয়। স্বাধীনতার পর সংবিধানে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ঘোষণার মাধ্যমে একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করা হয়।

### বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) গঠন

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী গণহত্যা শুরু করলে প্রাথমিকভাবে পূর্ব প্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ ও গণহত্যা শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তান হতে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের অধিকাংশ সদস্য প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নেন। তারা একত্রিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের

সরকার গঠন করেন। ১৩ এপ্রিল আগরতলায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের এক সভায় সরকার গঠন অনুমোদন করা হয়।

১৭ এপ্রিল অস্থায়ী সরকারের সদস্যগণ মেহেরপুর বৈদ্যনাথ তলায় শপথ গ্রহণ করেন। সরকারের প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নাম অনুসারে বৈদ্যনাথ তলার নামকরণ করা হয় মুজিবনগর এবং সরকার পরিচিত হয় মুজিবনগর সরকার নামে। আওয়ামী লীগের চীপ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী অস্থায়ী সরকারের (মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত) সদস্যদের শপথ পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এ সরকার গঠনের মাত্র দুই ঘন্টা পর পাকিস্তানি বাহিনীর বিমান মুজিবনগরে বোমাবর্ষণ করে এবং মেহেরপুর দখল করে নেয়। ফলে মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে স্থানান্তরিত হয়।

**মুজিবনগর সরকার**

| নাম | দপ্তর |
|---|---|
| রাষ্ট্রপতি | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান |
| উপ-রাষ্ট্রপতি | সৈয়দ নজরুল ইসলাম |
| প্রধানমন্ত্রী | তাজউদ্দিন আহমদ |
| পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় | খন্দকার মোশতাক আহমেদ |
| অর্থমন্ত্রণালয় | এম. মনসুর আলী |
| স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় | এ এইচ এম কামরুজ্জামান |
| প্রধান সেনাপতি | কর্নেল (অব.) এম. এ. জি. ওসমানী |
| চিফ অব স্টাফ | লে. কর্নেল (অব.) আবদুর রব |
| ডেপুটি চিফ অব স্টাফ | গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে খন্দকার |

উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে আটক থাকায় উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেয়া হয়। সরকারকে নীতি নির্ধারণী পরামর্শ ও সহযোগিতার একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। এসব বিভাগের মাধ্যমে যুদ্ধকালে সামরিক ও বেসামরিক যাবতীয় প্রশাসন পরিচালিত হয়।

## বাংলাদেশকে স্বীকৃত দানের আহ্বান

বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বহির্বিশ্বের সমর্থন আদায়ের জন্য মুজিবনগর সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্বে বিশেষ দূত নিয়োগ করেন। মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও যুদ্ধে সার্বিক সহযোগিতার জন্য বিশ্বের সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানান। শত্রুর মোকাবেলা করে দেশকে মুক্ত করার জন্য দেশবাসীর প্রতিও আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের নাগরিক এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইডেন, জাপান ও অন্যান্য প্রভাবশালী দেশের সমর্থন লাভের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালানো হয়।

## মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। এ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করা। বাঙালি কর্মকর্তাদের নিয়ে সরকার প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করেন। এতে মোট ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের জন্য মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে। ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক, বেসামরিক জনগণকে নিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধাবাহিনী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশকে প্রথমে ১০ এপ্রিল ৪টি এবং পরবর্তীকালে ১১ এপ্রিল ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি সেক্টরেই নিয়মিত সেনা, গেরিলা ও সাধারণ যোদ্ধা ছিল

যারা মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিফৌজ নামে পরিচিত ছিল। এসব বাহিনীতে দেশের ছাত্র, যুবক, কৃষক, নারী, রাজনৈতিক দলের কর্মী, শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নিয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে সরকারের অধীন বিভিন্ন বাহিনী ছাড়াও বেশ কয়েকটি স্থানীয় বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই বাহিনীগুলোও পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দেশিয় দোসরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। এসব বাহিনী সরকারের আওতার বাইরে নিজস্ব পদ্ধতিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করে। মুজিবনগর সরকার আতাউল গণি ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করে। তিনি মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করেন। তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস- এর বাঙালি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত সৈন্য ব্যাটেলিয়ান ই পি আর পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে মুক্তি বাহিনীর নিয়মিত বাহিনী গঠন করা হয়। নিয়মিত সেনা ব্যাটেলিয়ান পরে তিনটি বিগ্রেডে পরিণত হয় এবং বিগ্রেড কমান্ডার মেজর কে এম শফিউল্লাহ, মেজর জিয়াউর রহমান এবং মেজর খালেদ মোশাররফের নামের ইংরেজি আদ্যক্ষর অনুসারে বিগ্রেড তিনটির নামকরণ করা হয় যথাক্রমে এস ফোর্স, জেড ফোর্স এবং কে ফোর্স।

## মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে দীর্ঘ দিনের আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল। ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদান করে। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভেদ লক্ষ করা যায়। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকলেও পিকিং পন্থী হিসেবে পরিচিত একটি অংশ বিরোধিতা করে। পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী ইসলমপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। এই দলগুলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের অত্যাচার, নির্যাতন ও গণহত্যায় সহযোগিতা করে।

১৯৭১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে সমমনা বাম রাজনৈতিক দলসমূহ নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (ন্যাপ-ভাসানী), মণি সিংহ (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি), মনোরঞ্জন ধর (বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস), অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ (ন্যাপ-মুজাফফর)। আওয়ামীলীগ থেকে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ, অর্থমন্ত্রী মনসুর আলী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম কামারুজ্জামান। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশিয় দোসরদের অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ এদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। তাই মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, নারী, শিক্ষক, কবি, সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিল্পীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ শামিল হয়েছিলেন।

## স্বাধীনতাবিরোধী সংগঠন ও বাহিনী

মুক্তিবাহিনীর ক্রমবর্ধমান তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে ১৯৭১ সালের ১২ আগস্ট ইয়াহিয়া খান গভর্নর টিক্কা খানের স্থলে ডা. আব্দুল মালিককে গভর্নর নিযুক্ত করেন। ডা. মালিকের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি বেসামরিক সরকার গঠন করা হয়। পাকিস্তান সমর্থক রাজনীতিবিদদের ও ধর্মভিত্তিক দল জামায়াতে ইসলাম, নেজামে ইসলামী, পিডিপি, মুসলিম লীগের সমন্বয়ে শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। দেশব্যাপী এর শাখা কমিটিও গঠিত হয়। অত্যাচার, নির্যাতন ও গণহত্যায় এই সংগঠন দখলদার বাহিনীর বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে কাজ করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ জুড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা নির্যাতন, গণহত্যা আর ধ্বংসলীলায় মেতে উঠে। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এদেশের ছাত্রসমাজ, আওয়ামী লীগ সমর্থক, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়। স্বাধীনতাবিরোধীদের সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনী রাজধানী ঢাকা ছাড়াও বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশিয় দোসররা ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে। তিন লাখের অধিক মা-বোন পাকিস্তানিদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। পরিকল্পিতভাবে এদেশকে মেধাশূন্য করার জন্য পাকিস্তানি বাহিনী বরেণ্য সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। পাকিস্তানি বাহিনীকে নির্যাতন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ইত্যাদি মানবতাবিরোধী অপরাধে সহযোগিতা করেছে রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও শান্তি কমিটি।

পকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী সংগঠন হিসেবে রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনী গঠন করা হয়। রাজাকারদের প্রশিক্ষণ দিতো পাকিস্তানি বাহিনী এবং প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল এক সপ্তাহ। জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র

সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্যদের নিয়ে গড়ে তোলা হয় আলবদর বাহিনী। এই বাহিনী বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রধান দায়িত্ব পালন করে। অন্যান্য ইসলামী ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীদের নিয়ে গঠিত হয় আল-শামস বাহিনী। এই বাহিনী গণহত্যায় সহযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্যাম্প ও ব্রিজ পাহারা দিত। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের সব সম্পদ-প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনীর এসব মানবতাবিরোধী অপরাধে সহায়তা করেছে বিভিন্ন স্বাধীনতাবিরোধী সংগঠন ও  বাহিনী।

## মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের সমর্থন ও সাহায্য

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর নারকীয় তাণ্ডব বিশ্ববিবেককে নাড়া দেয়। বিভিন্ন দেশ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জানায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী দেশ ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহের সরকার ও জনগণ সমর্থন ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছিল। ভারতের তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর নিরলস কর্ম তৎপরতার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচিত করেন। যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রায় এককোটি লোক ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারতের সরকার ও জনগণ শরণার্থীদের ভরণ পোষণের দায়িত্বপালনসহ সবধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিল। ঐসব দেশের জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ছিল গভীর সহানুভূতি ও সমর্থন। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের সরকার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। ৬ ডিসেম্বর ভারত ও ভুটান বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

## মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণ

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকেই কুষ্টিয়া, দিনাজপুর ও যশোরের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল হানাদার বাহিনীর দখলমুক্ত হয়। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে ৪ ডিসেম্বর ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইন্দিরা গান্ধী সরকার ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার জন্য ভারত সরকার মিত্রবাহিনী পাঠায়। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী একত্রে যৌথ বাহিনী গঠন করে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে যশোর সেনানিবাস, সাতক্ষীরা, মাগুরা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, ভৈরব, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল মুক্ত করে যৌথ বাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে চলে আসে।

## বুদ্ধিজীবী হত্যা

যৌথ বাহিনীর ঢাকার উপকণ্ঠে আগমণ ও ভারতীয় বিমান বাহিনীর ঢাকা আক্রমণের প্রেক্ষাপটে ১৪ ডিসেম্বর গভর্ণর মালিকের নেতৃত্বাধীন সরকার পদত্যাগ করে। এ সময় পাকিস্তান বাহিনী তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর ও আল শামস এর সহযোগিতায় ব্যাপক গণহত্যা চালায়। যুদ্ধের শুরু থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, চিকিৎসক ও সাংবাদিকসহ অনেক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়। তবে ১০-১৪ ডিসেম্বর পরিকল্পিতভাবে আলবদর বাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। বাংলাদেশের ইতিহাস এ ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। হত্যাকাণ্ডের শিকার বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়।

## স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই ভারত বিভিন্নভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য সহযোগিতা করে। ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী মিলে 'যৌথ কমান্ড' গঠন করে। ৬-১৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর সাথে ভারতের সেনা, নৌ, বিমানবাহিনীও পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে। যৌথ বাহিনীর দুর্বার আক্রমণে পর্যুদস্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অবশেষে আত্মসমর্পণে সম্মত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তান বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্যসহ যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। পাকিস্তানের পক্ষে নিয়াজী এবং যৌথ বাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। এতে অস্থায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার উপস্থিত ছিলেন। পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় সম্পন্ন হয়। বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যূদয় হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | ক) একটি সারণিতে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ লিপিবদ্ধ করুন।<br>খ) স্বাধীনতাবিরোধী সংগঠন ও বাহিনীর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন এবং তাদের কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করুন। |

## সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশীদের সবচেয়ে বড় অহঙ্কার। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য এবং অসম্মান থেকে মুক্তি পেতে স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না। ফলে বাংলাদেশীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। নয় মাসের যুদ্ধে বিপর্যস্ত করে ফেলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে ভারতের মিত্রবাহিনী সাহায্যের হাত বাড়ায়। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তি অনেক বেড়ে যায়। এরই পরিণতিতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী মিলে ‘যৌথ কমান্ড’ গঠন করে

(ক) ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর (খ) ১৯৭১ সালের ২৫ নভেম্বর

(গ) ১৯৭১ সালের ২১ মার্চ (ঘ) ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ

২। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়?

(ক) ৯টি (খ) ১০টি

(গ) ১১টি (ঘ) ১৪টি

৩। ভারত ও ভুটান বাংলাদেশকে স্বাধীন ও স্বার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কবে?

(ক) ১ ডিসেম্বর ১০৭১ (খ) ০৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

(গ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ (ঘ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

৪। ১৪ ডিসেম্বর পালন করা হয়–

(ক) স্বাধীনতা দিবস (খ) বিজয় দিবস

(গ) শহীদ দিবস (ঘ) শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস

## পাঠ-২.৩ স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও বঙ্গবন্ধুর শাসনামল

## Reconstruction of Independent Bangladesh and the Regime of Bangabandhu

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–**

- বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনমূলক কাজের বিবরণ দিতে পারবেন;
- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা। |

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয় ঘটে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন দেশের পুনর্গঠন, প্রশাসনিক পুনর্গঠন, শরণার্থীর পুনর্বাসন, সংবিধান প্রণয়ন, নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের ফেরত পাঠানো, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি আদায় প্রভৃতি বঙ্গবন্ধুর সময়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন। কিন্তু দেশ স্বাধীনের কয়েক বছরের মধ্যেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধীদের দেশিয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন দেশে স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসন শুরু হয়।

### আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১১ জানুয়ারি তিনি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ অনুযায়ী দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় নেতৃত্বে মাত্র দু'মাসের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়। দেশের প্রতিটি জেলায় বেসামরিক প্রশাসন সচল হয়। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন ঃ বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্রীকরণ, শরণার্থীদের পূর্নবাসন, অবকাঠামোগত পূর্ণগঠন, পরিত্যাক্ত শিল্প কারখানা পরিচালনা, বর্হিবিশ্বের স্বীকৃতি ও সাহায্যের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনা প্রভৃতি।

### সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা

মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থার ধরণ কী হবে, এই সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত পূর্বে গ্রহণ করা হয়নি। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভায় দীর্ঘ আলোচনার পর 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারির মাধ্যমে দেশের সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের নিকট রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এরপর রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। একই দিনে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। এই ব্যবস্থা সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি বঙ্গবন্ধুর গভীর আস্থার পরিচয় বহন করে। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত হয়। এই সরকার মাত্র তিন বছর সাত মাস তিন দিন দায়িত্ব পালনের সুযোগ পায়। এই স্বল্পতম সময়ে তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে দেশকে গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে সম্মানজনক ভাবমূর্তি নির্মাণে অনন্য সাধারণ অবদান রাখেন।

## যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। বঙ্গবন্ধু সরকার একেবারেই শূন্য হাতে যাত্রা শুরু করেন। প্রশাসন, ভৌত অবকাঠামো সবকিছুই ছিল বিপর্যস্ত। নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস গণহত্যা, নারী নির্যাতনের পাশাপাশি সম্পদ বিনষ্টের এক ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছিল। সারা দেশের প্রায় ৪৩ লক্ষ বসতবাড়ি, ৩ হাজার অফিস ভবন, ১৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬ হাজার হাইস্কুল ও মাদ্রসা, ৯ শত কলেজ ভবন ও ১৯ হাজার গ্রামীণ হাট-বাজার জ্বালিয়ে দেয়। পরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানিবাহিনী যোগাযোগব্যবস্থাও ধ্বংস করে দেয়। ২৭৪টি ছোট-বড় সড়ক সেতু ও ৩০০টি রেল সেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রেলওয়ে ইঞ্জিন, বগি ও রেল লাইনেরও ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। মাইন পুঁতে রাখার কারণে নৌবন্দরগুলো ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। চূড়ান্ত পরাজয়ের পূর্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ব্যাংকসমূহে রক্ষিত কাগজের নোটগুলো জ্বালিয়ে দেয়। গচ্ছিত স্বর্ণ লুট করে নিয়ে যায়। ফলে ব্যাংকগুলো তহবিলশূন্য হয়ে পড়ে।

পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কঠিন দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করে সরকার। প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়ায় রেডক্রস সোসাইটি এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটির মাধ্যমে জেলা থেকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ১৯৭২ সালের শুরুতে পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য সরকারি হিসেবে মাসিকভিত্তিক এক চাহিদাপত্র তৈরি করা হয়। এতে প্রতি মাসে খাদ্যের প্রয়োজন ছিল দুই লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ টন এবং ওষুধসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা ছিল দুই লক্ষ টন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকার প্রধান হিসেবে ১৪ জানুয়ারি, ১৯৭২ প্রথম সংবাদ সম্মেলনে সরকারের জরুরি কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপনের পাশাপাশি বিশ্বের সকল রাষ্ট্র, স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদার সাহায্য প্রদানের আহ্বান জানান।

## কৃষির উন্নয়ন

বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ জনগণের জীবিকা ছিল কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি আসত কৃষিখাত থেকে। তাই বঙ্গবন্ধু কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। যেমন–

ক) ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফসহ পূর্বের সমস্ত বকেয়া খাজনা মওকুফ করে দেন।
খ) একটি পরিবারের সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা নির্ধারণ করেন।
গ) বাইশ লাখের অধিক কৃষক পরিবার পুনর্বাসন করা হয়।

## শিক্ষার উন্নয়ন

সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু মানবসম্পদের উন্নয়নে শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ছয় মাসের মধ্যে তিনি স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু জরুরি ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ৯০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাইস্কুল পুনর্নির্মাণ করেন। প্রথমবারের মতো সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় শিক্ষকদের পাওনা ৯ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করেন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করেন।

## যোগাযোগ ক্ষেত্রে উন্নয়ন

মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল ব্রিজ-সেতু জরুরি ভিত্তিতে পুনর্নির্মাণ শুরু হয়। ১৯৭৪ সালের মধ্যে দেশের যোগাযোগব্যবস্থা একটা সন্তোষজনক অবস্থায় উন্নীত হয়। ঢাকা-আরিচা সড়কের বড় বড় সড়ক সেতুগুলোসহ ৯৭টি নতুন সড়ক সেতু নির্মাণ করা হয়। হার্ডিঞ্জ ব্রিজসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত অন্যান্য রেল সেতুগুলোও চালু হয়। যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের ৪ নভেম্বর যমুনা সেতুর প্রাথমিক সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। অভ্যান্তরীণ ও আন্তর্জাতিক- উভয় রুটে বিমান চালু, তেজগাঁও বিমানবন্দর ব্যবহার উপযোগী করার কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়। ১৯৭২ সালের ৭ মার্চের মধ্যে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর ও কুমিল্লার বিমান যোগাযোগ কার্যকর হয়। ঢাকা-লন্ডন রুটে ১৯৭৩ সালের ১৮ জুন প্রথম ফ্লাইট চালু হয়।

## প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে নবীন রাষ্ট্র হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সরকার পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, দারিদ্র্য হ্রাস, প্রবৃদ্ধির হার ৩% থেকে ৫.৫%-এ উন্নীত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়।

## পররাষ্ট্রনীতি

তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পররাষ্ট্রনীতির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে আসার পূর্বে ভারত ও ভূটান ছাড়া আর কোনো রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায়নি বাংলাদেশ। পাকিস্তান ও তার মিত্রদের বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণায় বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র তখনও বিভ্রান্ত। অন্যদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ জরুরি হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও মেধা দিয়ে উপলব্ধি করেন যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রথমত: স্বীকৃতি আদায়ের মধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা এবং
দ্বিতীয়ত: দেশ পুনর্গঠনে বিদেশি সহায্য-সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে বঙ্গবন্ধু নীতিনির্ধারকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি সব সময় স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির কথা বলেছেন। ১৯৭২ সালের সংবিধানে পররাষ্ট্রনীতির রূপরেখায় বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হলো, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পক্ষে থাকবে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের জন্য স্বীকৃতি আদায়ের কাজটি খুব সহজসাধ্য ছিল না। কারণ, পাকিস্তানের বৈরী প্রচারণায় মুসলিম বিশ্বসহ চীন বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করত। বঙ্গবন্ধুর সফল নেতৃত্বে ১৯৭৪ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপানসহ বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র ও জাতিসংঘসহ প্রায় সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বীকৃতি লাভ করে। সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ যোগদান করে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে প্রথমবারের মতো মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দেন। ফলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলা ভাষা নতুন মর্যাদা লাভ করে। বঙ্গবন্ধু সরকার দেশের স্বার্থে পুঁজিবাদী ও মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বাংলাদেশ বিশ্বের ১৩০টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন করে। এ ছাড়া জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ ও ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদসহ ১৪টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করে।

## প্রথম সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭৩

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। স্বাধীনতা লাভের স্বল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে গণতন্ত্রের পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ ৩১৫টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ৩০৮, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ১টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ১টি এবং স্বতন্ত্র সদস্যরা ৫টি আসনে জয়লাভ করেন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অন্যান্য চৌদ্দটি দলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনে রাজনৈতিক দল সমূহের প্রার্থী ছিল ১,০৮৯ জন ও স্বতন্ত্র ছিল ১২০ জন অর্থাৎ মোট প্রার্থী ছিল ১,২০৯ জন। নারী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মোট ১৫ জন ।

**প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল**

| রাজনৈতিক দল | প্রাপ্ত আসন | সংরক্ষিত নারী আসন | মোট |
|---|---|---|---|
| বাংলদেশ আওয়ামী লীগ | ২৯৩ | ১৫ | ৩০৮ |
| জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) | ১ | - | ১ |
| বাংলাদেশ জাতীয় লীগ | ১ | - | ১ |
| স্বতন্ত্র | ৫ | - | ৫ |
| **মোট** | **৩০০** | **১৫** | **৩১৫** |

আওয়ামী লীগের প্রার্থীগণ ৩০০ সংসদীয় আসনের ২৯৩টি আসনে বিজয়ী হওয়ার মধ্যদিয়ে দলটি জাতীয় সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনে শতকরা ৫৫.৬১ ভাগ ভোটার ভোট প্রদান করে এবং আওয়ামী লীগ মোট ভোটের শতকরা ৭৩.২০ ভাগ লাভ করে। সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনসহ দলটির আসন সংখ্যা হয় ৩০৮। জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ১১টি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ৭ মার্চ নির্বাচনের পূর্বেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭৩-এর ১৬ মার্চ নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, নবসৃষ্ট চরমপন্থী দলগুলির তৎপরতা, আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এবং দুনীর্তির কারণে সদ্য স্বাধীনতা হওয়া দেশে এক সংকটের সৃষ্টি হয়।

## রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন আনা হয়। এই সংশোধনী অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। তিনি ইচ্ছানুযায়ী উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগের কর্মকর্তা নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারবেন। ১৯৭৫-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্যান্য রাজনৈতিক দল ভেঙ্গে দিয়ে ‘বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ’ (বাকশাল) নামে একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের চেয়ারম্যান হলেন বঙ্গবন্ধু এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন এম. মনসুর আলী।

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকারব্যবস্থার পরিবর্তন নানা বিতর্কের জন্ম দেয়। তবে বঙ্গবন্ধু নতুন সরকার পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি সাময়িকভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। দেশের আর্থ-সামাজিক ও আইনশৃঙ্খলার জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনিবার্য হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিও চতুর্থ সংশোধনী গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিল। উল্লেখ্য, বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে একক রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার নজির রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সরকার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক সংস্কার কার্যক্রম চালু করেন। জেলা প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো হয়। জেলা সমূহে রাজনৈতিক প্রশাসনিক গভর্ণর নিয়োগ করা হয়। মুদ্রা মানের সংস্কার, খাদ্য উৎপাদনে নতুন উদ্যোগে, রফতানি প্রসারে নতুন কৌশল গ্রহণ করা হয়। নতুন রাষ্ট্রিক কাঠামোর কার্যক্রম এবং ঘোষিত নীতিমালা বাস্তবায়নের মুহূর্তে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাসী ও বিপথগামী সেনাসদস্য স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তির মদদে বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের নিজ বাড়িতে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর ছোট ছেলে ১০ বছরের নিষ্পাপ শিশু রাসেলও ঘাতকের নির্মম বুলেটের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দেশের বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী ভাবাদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশ গভীর রাজনৈতিক সংকটে পড়ে। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনমূলক কাজের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। |

## সারসংক্ষেপ

একটি দীর্ঘ সংগ্রাম ও স্বাধীনতাযুদ্ধে জয় লাভের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে প্রথম সরকার গঠিত হয়। স্বাধীনতার সংগ্রাম ও নয়মাস ব্যাপী যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন মতের ও দলের ভূমিকা এবং চাওয়া পাওয়া ছিল ভিন্ন। তাই স্বাধীনতা উত্তর রাজনীতিতে এদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে যায়। কিন্তু সরকারের পক্ষে উদ্ভুত সকল সমস্যা ও জনগণের চাওয়া- পাওয়ার সমাধান সম্ভবপর হয়নি। এতদসঙ্গে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি আওয়ামী লীগ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ১৯৭২ সালে সংবিধান রচনার মাধ্যমে সংসদীয় সরকার প্রবর্তন করেও সে প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা যায়নি। তিন বৎসরের মধ্যেই সরকার সংবিধান পরিবর্তন কর একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যূত্থানে দেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। ফলে বাংলাদেশের সাংবিধানিক ধারা ব্যহত হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়–

(ক) ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ (খ) ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ

(গ) ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ (ঘ) ১৯৭৩ সালের ১৯ মে

২। কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় কবে?

(ক) ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর (খ) ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ

(গ) ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই (ঘ) ১৯৭৩ সালের ১৯ মে

৩। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বাংলাদেশ বিশ্বের কতটি দেশের স্বীকৃতি অর্জন করে?

(ক) ৫০টি (খ) ১০০টি

(গ) ১২০টি (ঘ) ১৩০টি

# পাঠ-২.৪ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন
## Formulation of the Constitution of Bangladesh

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–**

- স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের সংবিধানের স্বকীয় বৈশিষ্টগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | সংবিধান। |

### ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ন

সংবিধান হলো একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থার ধরণ কী হবে সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি 'বাংলাদেশ অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ' জারী করে। আদেশে বলা হয়, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। এই আদেশে আরো বলা হয় একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রিসভা বাংলাদেশের একজন নাগরিককে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করবেন।

### বাংলাদেশের প্রথম গণপরিষদ

সংবিধান রচনার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' জারি করেন। এই আদেশে অনুসারে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্যরা গণপরিষদের সদস্য হবেন। সংবিধান প্রণয়নই ছিল গণপরিষদের একমাত্র লক্ষ্য। আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়। এই আদেশ জারির মধ্য দিয়ে সংবিধান প্রণয়নের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি বঙ্গবন্ধুকে গণপরিষদের দলীয় নেতা নির্বাচন করে। ৪৩০ সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট 'একটা খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' (Draft Constitution Committee) গঠিত হয়। এ কমিটিতে সংসদে নারী আসন থেকে বেগম রাজিয়া বানু ছিলেন একমাত্র মহিলা সদস্য। কমিটি মোট ৭৪টি বৈঠক মিলিত হয়। কমিটি ১৯৭২ সালের ১০ জুন অনুষ্ঠিত সভায় সংবিধানের প্রাথমিক খসড়া অনুমোদন করে। খসড়া সংবিধান নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা শেষে ১১ অক্টোবর কমিটির শেষ সভায় সংবিধানের পূর্ণাঙ্গ খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে খসড়া সংবিধান বিল আকারে পেশ করা হয়। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান গৃহিত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকার মাত্র দশ মাসে বাংলাদেশকে একটি সংবিধান উপহার দিতে সক্ষম হয়। এটি বঙ্গবন্ধু সরকারের সবচেয়ে বড় সফলতাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

## সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১৯৭২-এর সংবিধান হলো একটি সু-লিখিত দলিল। সংবিধান বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় রচিত হয়। তবে বাংলাকে মূল ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার ৪টি মূলনীতি লিপিবদ্ধ করা হয়। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মূল স্তম্ভ হিসবে ঘোষণা করা হয়। এই সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ৪টি তফসিল ছিল। সংবিধানের প্রথম ভাগে প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ, দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ, তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারসমূহ, চতুর্থ ভাগে নির্বাহী বিভাগ, পঞ্চম ভাগে জাতীয় সংসদ, ষষ্ঠ ভাগে বিচার বিভাগ, সপ্তম ভাগে নির্বাচন, অষ্টম ভাগে মহাহিসাব নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রক, নবম ভাগে কর্ম কমিশন, দশম ভাগে সংবিধান সংশোধন ও একাদশ ভাগে বিবিধ বিষয়াবলি আলোচনা করা হয়েছে।

১. **সর্বোচ্চ আইন:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হলো বাংলাদেশের সংবিধান। তাই সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে না। সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। কেবল সংবিধানের অধীনে থেকে জনগণের পক্ষে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে।

২. **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি :** সংবিধানের প্রস্তাবনায় জাতীয়বাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই চারটি আদর্শকে গ্রহণ করা হয় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে।

ক. **জাতীয়বাদ :** পাকিস্তান আমলের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাতিল হয়ে যায়। এর বিপরীতে ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম। অসাম্প্রদায়িক চেতনা হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

খ. **সমাজতন্ত্র :** বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সব সময় সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলেছেন। স্বাধীনতার পর দেশের মানুষের স্বপ্ন ছিল সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক চাহিদা পূরণে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। তাই সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মূলত মানুষের ওপর মানুষের শোষণহীন সমাজ গঠনের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করাই ছিল এর লক্ষ্য।

গ. **গণতন্ত্র :** পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে এই অঞ্চলের জনগণ ১৯৪৭ থেকেই কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার পায় নি। সংবিধানের উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি হবে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালিত হবে।

ঘ. **ধর্মনিরপেক্ষতা :** সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ছিল সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করা। কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান না করা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে না। প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয় অধিকার ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেবে রাষ্ট্র।

৩. **মৌলিক অধিকার :** নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কিছু অধিকারের নিশ্চয়তা থাকা জরুরি যাতে করে ব্যক্তি স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করতে না পারে। তাই সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহকে অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৪. **এককেন্দ্রিক সরকার :** সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশে কোনো প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্য নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সারা দেশের প্রশাসন পরিচালিত হয়।

৫.**মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার :** সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদকে সংসদের নিকট দায়ী থাকতে হয়। রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক প্রধান। তবে রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত ছিল। রাষ্ট্রপতি নামমাত্র প্রধান।

৬. **এক কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ :** ৭২-এর সংবিধানে এক কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়। সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ জন সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা আসনে ১৫ জন সদস্য নিয়ে আইন পরিষদ গঠিত হবে। আইন পরিষদ জাতীয় সংসদ বলে অভিহিত হবে।

৭. **দুস্পরিবর্তনীয় :** এই সংবিধান সংশোধনের এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতির মতো সহজ নয়। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের মোট সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট প্রয়োজন হবে। সংবিধান সংশোধনী বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পেশ করা হবে। ৭ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি বিলে সম্মতি দেবেন। ৭ দিন অতিক্রান্ত হলে সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরে নেয়া হবে।

৮.**স্বাধীন বিচার বিভাগ :** সংবিধানে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে রাষ্ট্র। সংবিধানের বিধানাবলি অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন।

৯. **সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ :** সংবিধানের মূলনীতির সঙ্গে মিল রেখে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। ধর্মের নামে কেউ যাতে বিভেদ তৈরি করতে না পারে।

বঙ্গবন্ধু সরকারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হলো স্বল্পত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। সংবিধানের বিধানাবলির মধ্য দিয়ে সদ্য স্বাধীন দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে ।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | বাংলাদেশের সংবিধানের স্বকীয় বৈশিষ্টগুলো লিখুন। |

## সারসংক্ষেপ

সংবিধান হচ্ছে একটি দেশের সর্বোচ্চ আইন। একটি দেশের চরিত্র কী হবে তা নির্ধারিত হয় এর সংবিধানের মধ্য দিয়ে। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে পুনর্গঠনমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি সংবিধান প্রণয়নের মত একটি কাজ সত্যিই কঠিন। দেশ স্বাধীনের মাত্র এক বছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করেছিল। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে বাংলাদেশের সংবিধান সুলিখিত এবং দুস্পরিবর্তনীয়। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতিতে এ সংবিধান অনন্য স্বকীয়তার অধিকারী।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যাটি–

(ক) ৩০টি (খ) ২০টি

(গ) ১৫টি (ঘ) ৪০টি

২। সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন–

(ক) ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার (খ) ড. কামাল হোসেন

(গ) ড. জহির (ঘ) আব্দুস সামাদ আজাদ

৩। ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বর্ণিত আছে–

(ক) ৮টি (খ) ৫টি

(গ) ৪টি (ঘ) ৩টি

## উত্তরমালা :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.১ ঃ | ১। গ | ২। খ | ৩। ঘ | |
| পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.২ ঃ | ১। ক | ২। গ | ৩। খ | ৪। ঘ |
| পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৩ ঃ | ১। খ | ২। গ | ৩। ঘ | |
| পাঠোত্তর মূল্যায়ন ২.৪ ঃ | ১। গ | ২। খ | ৩। গ | |
| চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ | ১। ক | ২। খ | ৩। ক | ৪। গ |

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### কাঠামোবদ্ধ (সৃজনশীল) প্রশ্ন

**১) নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।**

শফিক তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষককে কেবল সমীহ করে না, ভীষণভাবে শ্রদ্ধাও করে। কারণ তিনি একজন ভালো মানুষ। কয়েক দিন আগে “মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনো” নামে শফিকদের স্কুলে একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান হয়েছে। এ অনুষ্ঠানে গিয়ে শফিক জানতে পারল, তাদের প্রধান শিক্ষক একজন মুক্তিযোদ্ধা। স্যারের মুখে মুক্তিযুদ্ধের নানা ঘটনা, স্যারের অংশগ্রহণে সংঘটিত অপারেশন ইত্যাদি শুনে শফিক অভিভূত। সেই সাথে স্যারের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ আরো অনেক বেড়ে গেল।

(ক) ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ কী? ১

(খ) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো লিখুন? ২

(গ) বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী সংগঠন ও বাহিনীর কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিন। ৩

(ঘ) বাংলাদেশের সংবিধানের মূল চার নীতি ব্যাখ্যা করুন। ৪

**২) নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।**

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্জন মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ। এ স্বাধীনতা অর্জনে শহীদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন। তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। আবার রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস, শান্তিবাহিনীর ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। তারা পাকিস্তানী বাহিনীকে সহযোগিতার পাশাপাশি লুট, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি অপরাধ করেছে। সদ্য স্বাধীন দেশকে মেধাশূন্য রাখতে তারা পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছে। এদের জন্য কেবলই ঘৃণা।

(ক) কে কবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন? ১

(খ) বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো কী ছিল? ২

(গ) বাহাত্তরের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন। ৩

(ঘ) বঙ্গবন্ধুর শাসনামালের সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। ৪